মহাবিশ্বের প্রথম তিন মিনিট

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

ইতিহাসবিদদের মতো কসমোলজিস্টরাও জানেন, ভবিষ্যত জানতে হলে তাকাতে হয় অতীতের দিকে। আগের অধ্যায়ে আমি ব্যাখ্যা করেছি, কীভাবে তাপগতিবিদ্যার সূত্র মহাবিশ্বের নির্দিষ্ট বয়সের ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রায় সকল বিজ্ঞানী একমত যে প্রায় দশ থেকে বিশ বিলিয়ন বছর আগে একটি বৃহৎ বিস্ফোরণের (বিগ ব্যাং) মাধ্যমে মহাবিশ্বের জন্ম। এবং মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়তি কী হবে সেটাও ঠিক হয়ে গেছে এই ঘটনার সাথে সাথে। মহাবিশ্বের শুরু কী করে হয়েছিল এবং প্রাথমিক দশায় এটি কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল সেটা জেনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির খুব একটি মৌলিক বিশ্বাস হলো মহাবিশ্বটা সবসময় ছিল না। গ্রিক দার্শনিকরা চিরন্তন মহাবিশ্বের কথা বললেও পাশ্চাত্যের সবগুলো বড় ধর্মই বলেছে, ঈশ্বর অতীতের নির্দিষ্ট কোনো সময়েই মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন।

মহাবিশ্বের আকস্মিক সূচনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুবই জোরালো। সবচেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল দূরবর্তী ছায়াপথগুলো থেকে আসা আলোর আচরণ বিশ্লেষণ করে। ১৯২০ এর দশকে আমেরিকান জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, দূরবর্তী ছায়াপথগুলো থেকে আসা আলো নিকটবর্তীদের তুলনায় কিছুটা লাল হয়ে যাচ্ছে। তাঁর আগে ভেস্টো স্লিফার নামে একজন নেবুলা বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে গিয়েছিলেন। কাজ করতেন অ্যারিজোনার ফ্ল্যাগস্ট্যাফ মানমন্দিরে (observatory)। আর হাবল ব্যবহার করেছিলেন ১০০ ইঞ্চির মাউন্ট উইলসন টেলিস্কোপ। এরপর যত্নের সাথে লাল হয়ে যাওয়ার পরিমাণ পরমািপ করলেন ও গ্রাফে আঁঁকলেন। দেখলেন, এখানে একটি নিয়ম কাজ করছে। যে ছায়াপথ আমাদের থেকে যত দূরে আছে, তাকে তত বেশি লাল দেখাচ্ছে।

আলোর রং এর তরঙ্গদৈর্ঘের সাথে সম্পর্কিত। সাদা আলোর বর্ণালিতে নীল রং এর অবস্থান ছোট তরঙ্গদৈর্ঘের প্রান্তে আর লাল এর অবস্থান হলো লম্বা তরঙ্গদৈর্ঘের প্রান্তে। যেহেতু দূরের ছায়াপথগুলোর আলো লাল হয়ে যাচ্ছে, তার মানে তাদের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কোনোভাবে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। হাবল খুব যত্নের সাথে অনেকগুলো ছায়াপথের বর্ণালির বৈশিষ্ট্যসূচক রেখার অবস্থান চিহ্নিত করে এ আচরণ সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। তিনি বললেন, আলোক তরঙ্গ বড় হয়ে যাবার কারণ হলো মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। অতি গুরুত্বপূূর্ণ এ বক্তব্যের মাধ্যমেই হাবল আধুনিক কসমোলজির সূচনা করলেন।

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ধারণা অনেকইে ঠিকভাবে বুঝতে পারেন না। পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয়, দূরের সব ছায়াপথ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আছে। প্রসারণের প্রকৃতি পুরো মহাবিশ্ব জুড়ে (গড়ে) একই রকম। প্রতিটি ছায়াপথ, বা আরো ভালোভাবে বললে প্রতিটি ছায়াপথপুঞ্জ বা স্তবক (cluster of galaxies) একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ চিত্র ভালোভাবে বোঝার জন্যে ছায়াপথপুঞ্জগুলো মহাশূন্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছে — এভাবে চিন্তা না করে মনে করুন, ছায়াপথপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থান ফুলে উঠছে বা লম্বা হয়ে যাচ্ছে।

স্থান প্রসারিত হচ্ছে– কথাটি বিস্ময়কর শোনাতে পারে। কিন্তু ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর সার্বিক আপিক্ষকতা তত্ত্ব প্রকাশের পর থেকেই বিজ্ঞানীরা এ ধারণার সাথে পরিচিত। এ তত্ত্ব অনুসারে মহাকর্ষ আসলে স্থানের (সঠিক করে বললে স্থানকালের) বক্রতা বা বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ। এক অর্থে স্থান হলো স্থিতিস্থাপক। এটি এর মাঝে উপস্থিত পদার্থের মহাকর্ষীয় ধর্মের ওপর ভিত্তি করে বেেঁক যেতে বা প্রসারিত হতে পারে। পর্যবেক্ষণ থেকে এ ধারণার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

One-dimensional Model of Expanding Universe

Figure 3.1: One-dimensional Model of Expanding Universe

চিত্র ৩.১: সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের একটি একমাত্রিক নমুনা। বিন্দুগুলো দ্বারা ছায়াপথপুঞ্জ নির্দেশ করা হচ্ছে। আর স্থিতিস্থাপক সুতা দিয়ে স্থান বোঝানো হয়েছে। সুতাকে লম্বা করা হলে বিন্দুগুলো দূরে সরে। এর ফলে সুতার ওপর দিয়ে চলমান কোনো তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বড় হবে। হাবলের আবিষ্কৃত লোহিত সরণও13 এভাবেই কাজ করে।

একটি সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে সম্প্রসারণশীল স্থানের মৌলিক ধারণা বুঝে নেওয়া যায়। মনে করুন, একটি স্থিতিস্থাপক সুতার ওপর অনেকগুলো বিন্দু আছে (দেখুন চিত্র ৩.১)। বিন্দুগলো দ্বারা ছায়াপথপুঞ্জ নির্দেশ করা হচ্ছে। এবার মনে করুন, আপনি সুতাটিকে দুই প্রান্ত থেকে ধরে টান দিয়ে লম্বা করে ফেললেন। প্রতিটি বিন্দু একে অপরটি থেকে সরে যাচ্ছে। আপনি যে বিন্দুর কথাই চিন্তা করুন না কেন, তার পাশের বিন্দুগুলোকে দূরে সরতে দেখা যাচ্ছে। তার ওপর প্রসারণ সব দিকে একই রকম। কোনো বিশেষ কেন্দ্র বলতে কিছু নেই। অবশ্য আমি এটাকে এখানে যেভাবে এঁকেছি, তাতে একটি বিন্দু কেন্দ্রে আছে। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় এখানে প্রসারণ ঘটছে, তার সাথে এই কেন্দ্রীয় বিন্দুর কোনো সম্পর্ক নেই। বিন্দুসহ সুতাটি যদি অসীম সাইজের হতো অথবা সুতাটি যদি বৃত্তাকার হতো, তবে এই কেন্দ্রটি আর থাকতো না।

যে-কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চিন্তা করলে দেখা যায়, তার নিকটতম বিন্দুগুলো পরের নিকট বিন্দুগুলো থেকে অর্ধেক গতিতে দূরে সরছে। এবং তারও পরের নিকট বিন্দুগলো থেকে আরও অর্ধেক গতিতে সরছে। এভাবেই চলছে। একটি বিন্দু যত দূরে আছে, সেটি তত দ্রুত সরে যাচ্ছে। এ ধরনের প্রসারণের ক্ষেত্রে দূরে সরে যাওয়া মানে সরণের হার দূরত্বের সমানুপাতিক। সম্পর্কটা বেশ শক্তিশালী। ছবিটি দেখে আমরা সম্প্রসারণশীল স্থানে বিন্দুগুলো, মানে ছায়াপথপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে চলাচলরত আলোক তরঙ্গর কথা কল্পনা করতে পারি। স্থানের সাথে সাথে তরঙ্গও প্রসারিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে মহাজাগতিক লোহিত সরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হাবল দেখলেন, লোহিত সরণের পরিমাণ দূরত্বের সমানুপাতিক। ঠিক ছবিতে যেমনটা দেখানো হয়েছে সেভাবে।

মহাবিশ্ব যদি সম্প্রসারণশীল হয়েই থাকে, তাহলে অতীতে নিশ্চয়ই এটি আরও জড়সড় ছিল। হাবলের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রসারণের হার পরিমাপ করা যায়। পরবর্তীতে পর্যবেক্ষণের মান আরও অনেক উন্নত হয়। হারও বের করা হয় আরও ভালোভাবে। মহাজাগতিক চিত্রটিকে পেছনের দিকে চালিয়ে দিলে আমরা দেখব, কোনো এক দূর অতীতে সবগুলো ছায়াপথ একে অপরের সাথে মিশে ছিল। বর্তমান সময়ের প্রসারণের হার জেনে আমরা অনুমান করতে পারি যে এই মিশ্রিত অবস্থা ছিল বহু বিলিয়ন বছর আগে। তবে দুটি কারণে সেই সময়টি সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। প্রথমত, বিভিন্ন কারণে সঠিক করে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। নানাভাবে ভুল হয়েই যায়। অবশ্য আধুনিক টেলিস্কোপের মাধ্যমে আগের চেয়ে বেশি সংখ্যক ছায়াপথ নিয়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এর পরেও প্রসারণের হার এখনও অনিশ্চিত। সেটা কমপক্ষে দুই গুণ পর্যন্ত কম-বেশি হতে পারে। এটা এখনও বিতর্কের বড় একটি বিষয়।14

দ্বিতীয়ত, মহাবিশ্বের প্রসারণ হার সব সময় একই থাকে না। এর জন্যে দায়ী হলো মহাকর্ষ বল। মহাকর্ষ বল ছায়াপথগুলোর মধ্যে তো কাজ করেই, এটা কাজ করে মহাবিশ্বের সব ধরনের পদার্থ এবং শক্তির মধ্যেও। মহাকর্ষ গাড়ির ব্রেইকের মতো আচরণ করে। এর কারণে ছায়াপথগুলো বাইরের দিকে ছুটে যেতে বাধা পায়। ফলে, সময়ের সাথে সাথে প্রসারণ হার ধীরে ধীরে কমে আসে। তার মানে, অতীতে নিশ্চয়ই মহাবিশ্ব আরও দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল। গ্রাফে যদি সময়ের বিপরীতে মহাবিশ্বের একটি আদর্শ এলাকার সাইজ দেখানো হয়, তাহলে ৩.২ নং চিত্রের মতো একটি সাধারণ রেখা পাওয়া যায়। গ্রাফে দেখা যাচ্ছে, মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছে খুব নিবিড় অবস্থা থেকে। তারপর থেকে প্রসারণ ঘটছে খুব দ্রুত বেগে। এবং সময়ের সাথে সাথে মহাবিশ্বের আয়তন যত বেড়েছে, পদার্থের ঘনত্বও নিয়মিত ভিত্তিতে ততই কমে গেছে। রেখাটি ধরে পেছন দিকে এগোতে এগোতে সূচনা পর্যন্ত গেলে (চিত্রের ০ অবস্থানে) দেখা যায়, মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে শূন্য সাইজ থেকে। আর সে সময় প্রসারণ হার ছিল অসীম। অন্য কথায়, আমরা আজ যেসব ছায়াপথ দেখছি, এগুলো যে পদার্থ দিয়ে তৈরি সেগুলোর সূচনা হয়েছে তীব্র গতির একটিমাত্র বিন্দু থেকে। তথাকথিত বিগ ব্যাং এর এটি একটি আদর্শায়িত বিবরণ।

Rate of Expansion

Figure 3.2: Rate of Expansion

চিত্র ৩.২: চিত্রে যেমনটা দেখানো হলো অনেকটা সেভাবেই মহাবিশ্বের প্রসারণ হার সময়ের সাথে সাথে নিয়মিত ভিত্তিতে কমে আসে। সরল এ নমুনায় সময়ের অক্ষের শূন্য বিন্দুতে প্রসারণ হার অসীম। এ বিন্দুটিই বিগ ব্যাংয়ের সময় নির্দেশ করছে। কিন্তু রেখাটিকে পেছনটা পর্যন্ত টেনে যাওয়ার চিন্তাটা কতটুকু যৌক্তিক? অনেক কসমোলজস্টি মনে করেন, কাজটা ঠিকই আছে। যেহেতু আমরা আশাই করছি যে মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে (আগের অধ্যায়ে আলোচিত কারণগুলোর সাহায্যে) অতএব, নিশ্চিতভাবে মনে হচ্ছে সেটা বিগ ব্যাংই হবে বলে। যদি সেটাই হয়, তাহলে রেখার সূচনা বিন্দুটি যেনতেন কোনো বিস্ফোরণ নয়। মনে রাখতে হবে, এখানের গ্রাফটিতে খোদ স্থানেরই প্রসারণ দেখানো হয়েছে। অতএব, শূন্য আয়তনের অর্থ শুধু এটাই নয় যে পদার্থ অসীম ঘনত্বের স্থানে গুটিয়ে আছে। এর আরও অর্থ হলো, স্থান গুটিয়ে আছে শূন্যতার (nothing) মাঝে। অন্য কথায়, বিগ ব্যাং একই সাথে স্থান এবং পদার্থ ও শক্তির সূচনা। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বুঝতে হবে। এ ধারণা অনুসারে আগে থেকে এমন কোনো শূন্যস্থান ছিল না, যেখানে বিগ ব্যাং ঘটেছিল।

সময় সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। পদার্থের অসীম ঘনত্ব এবং স্থানের অসীম সঙ্কোচন সময়েরও একটি সীমানা বেঁধে দেয়। কারণ, মহাকর্ষ সময় এবং স্থান দুটোকেই লম্বা করে দেয়। এটাও আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতা তত্ত্বের একটি ফলাফল। পরীক্ষামূলকভাবে এর সরাসরি প্রমাণও পাওয়া গেছে। বিগ ব্যাংয়ের পরিবেশ বলছে, স্থানের বিকৃতি ছিল অসীম। ফলে বিগ ব্যাংয়ের আগের সময় (এবং স্থানের) এর ধারণা এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছি যে বিগ ব্যািংই হলো সকল ভৌত জিনিস—স্থান, কাল, পদার্থ ও শক্তির—চূড়ান্ত সূচনা। “বিগ ব্যাং এর পূর্বে কী ঘটেছিল?” এমন প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই (যদিও অনেকেই প্রশ্নটি করে থাকেন)। অথবা এমন প্রশ্ন যে কেনই বা বিস্ফোরণটি ঘটেছিল? পূর্ব বলতেই কিছু ছিল না। আর যেখানে সময়েরই অস্তিত্ব নেই সেখানে সাধারণ অর্থে কার্যকারণ বলতেও কিছু থাকে না।

মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কে বিগ ব্যাং তত্ত্বের বক্তব্যগুলো অদ্ভূত। তবে বিগ ব্যাংয়ের প্রমাণের জন্যে যদি মহাবিশ্বের প্রসারণের ওপরই নির্ভর করা হত, তাহলে সম্ভবত অনেক কসমোলজিস্টই একে মেনে নিতেন না। কিন্তু ১৯৬৫ সালে তত্ত্বটির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আরও প্রমাণ এল। জানা গেল, পুরো মহাবিশ্ব তাপীয় বিকিরণে পরিপূর্ণ। মহাশূন্য থেকে আসা এ বিকিরণ বিগ ব্যাংয়ের অল্প সময় পরের। আসছে আকাশের সব দিক থেকে একই তীব্রতা নিয়ে। অন্য কিছু দ্বারা এটি বাধাগ্রস্থ হয় না বললেই চলে। ফলে এটি আমাদের সামনে আদিম মহাবিশ্বের অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরছে। এই তাপীয় বিকিরণের বর্ণালির সাথে তাপগতীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছা একটি চুল্লির উত্তাপের হুবহু মিল রয়েছে। এ ধরনের বিকিরণকে পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ15। ফলে আমরা বুঝতে পারছি, প্রাথমিক মহাবিশ্ব এমন একটি সাম্যাবস্থায়ই ছিল। সর্বত্র তাপমাত্রা ছিল একই রকম।

এই পটভূমি তাপীয় বিকিরণ পরিমাপ করে জানা গেল, এর তাপমাত্রা হলো পরম শূন্য তাপমাত্রার চেয়ে প্রায় তিনি ডিগ্রি বেশি (পরম শূন্য তাপমাত্রা হলো মাইনাস ২৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। প্রসারণের সাথে সাথে একটি সরল সূত্র মেনে মহাবিশ্ব ঠাণ্ডা হতে থাকে। ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ হলে তাপমাত্রা অর্ধেকে নেমে আসে। এই শীতলীকরণ প্রভাব আর আলোর লোহিত সরণ একই জিনিস। তাপীয় বিকিরণ আর আলো—দুটোই তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ দ্বারা গঠিত। এবং মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে তাপীয় বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বড় হতে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রার চেয়ে নিম্ন তাপমাত্রার বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (গড়ে) অপেক্ষাকৃত বড় হয়। আবার, উল্টো করে দেখলে আমরা দেখি, অতীতে মহাবিশ্ব অবশ্যই অনেক বেশি উত্তপ্ত ছিল। এই বিকিরণের সূচনা ঘটেছিল বিগ ব্যাংয়ের তিন লক্ষ বছর পরে। যে সময় শীতল হতে হতে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা নেমে এসেছিল প্রায় ৩০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এই সময়ের আগে মূলত হাইড্রোজেন দিয়ে গঠিত আদিম গ্যাস ছিল আয়নিত প্লাজমা16 আকারে। এ কারণে সে সময় এ গ্যাসের ভেতর দিয়ে তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ সঞ্চালিত হতে পারত না। তাপমাত্রা কমলে প্লাজমা সাধারণ (অ-আয়নিত) হাইড্রোজেন গ্যাসে পরণিত হলো। বিকিরণ এর মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হতে পারে। ফলে বিকিরণ এবার মুক্তভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

পটভূমি বিকিরণ একটু আলাদা। সেটা শুধু এর বর্ণালির কৃষ্ণবস্তুর মতো আচরণের জন্যেই নয়। আকাশের সব দিকে এটি দারুণভাবে একই রকম। মহাশূন্যের আলাদা দিকে এই বিকিরণের তাপমাত্রার পার্থক্য মাত্র এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ। এটা থেকে বোঝা যায়, বড় মাপকাঠিতে চিন্তা করলে মহাবিশ্ব যোগ্যভাবে সমধর্মী। কারণ, স্থানের কোনো একটি অঞ্চলে বা নির্দিষ্ট কোনো দিকে যদি পদার্থ নিয়মতান্ত্রিকভাবে পুঞ্জিভূত হতো, তাহলে তাপমাত্রার পার্থক্য দেখা যেত। অন্য দিকে আমরা জানি, মহাবিশ্ব পুরোপুরি সুষম নয়। পদার্থ একীভূত হয়ে ছায়াপথ তৈরি হয়ে আছে। বিভিন্ন ছায়াপথ মিলে আবার তৈরি হয় ক্লাস্টার বা স্তবক। এই ক্লাস্টাররা আবার তৈরি করে সুপারক্লাস্টার। বহু মিলিয়ন আলোকবর্ষের মাপকাঠিতে মহাবিশ্বের আকৃতি অনেকটা ফেনার মতো। বিপুল পরিমাণ শূন্যতার মাঝে মাঝে ছায়াপথ তন্তুর উপস্থিতি।

Galaxy Filament

Figure 3.3: Galaxy Filament

চিত্র: ৩.২.১: (ছায়াপথ তন্তুর (Galaxy filament) চেহারা বড় মাপকাঠিতে ৩.২.১ চিত্রের মতো। এটি হলো মহাবিশ্বের জানা কাঠামোগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। দৈর্ঘ্য হতে পারে ১৬ কোটি থেকে ২৬ কোটি আলোকবর্ষ পর্যন্ত। -অনুবাদক)

বড় স্কেলে মহাবিশ্বের এই গুচ্ছবদ্ধতা প্রারম্ভিক মসৃণ অবস্থা থেকেই কোনোভাবে জন্ম নিয়েছে। এর পেছেনে অনেকগুলো ভৌত কারণ থাকতে পারে। তবে সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা হলো ধীর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ। বিগ ব্যাং তত্ত্ব সঠিক হয়ে থাকলে গুচ্ছবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ার প্রাথমিক অবস্থার কিছু প্রমাণ মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের মধ্যে থাকার কথা। ১৯৯২ সালে কোব (COBE বা Cosmic Background Explorer) নামে নাসার একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে জানা যায়, বিকিরণ পুরোপুরি মসৃণ নয়। আকাশের এক দিক থেকে আরেক দিকে এতে সুস্পষ্ট ছন্দপতন দেখা যাচ্ছে। অথবা দেখা যাচ্ছে তীব্রতার উঠা-নামা। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছন্দপতনগুলোই সুপারক্লাস্টারদের গঠন প্রক্রিয়ার নির্বিঘ্ন সূচনা করেছিল। এ বিকিরণ আদিম গুচ্ছবদ্ধতার চিহ্ন আস্থার সাথে ধরে রেখেছে। সেটাও আবার বহু কাল যাবত। এর গ্রাফ বলছে, আজ আমরা যে সৃশৃঙ্খল স্বতন্ত্র মহাবিশ্ব দেখছি, এটি সব সময় এমন ছিল না। শুরুতে মহাবিশ্ব ছিল প্রায় পুরোপুরি সুষম অবস্থায়। একটি লম্বা বিবর্তনের মাধ্যমে পদার্থ পুঞ্জীভূত হতে হতে পরবর্তীতে ছায়াপথ ও নক্ষত্রের জন্ম হয়।

উত্তপ্ত ঘন অবস্থা থেকে মহাবিশ্বের জন্ম হওয়ার পক্ষে আরেকটি চূড়ান্ত প্রমাণও আছে। আজকের দিনের তাপীয় বিকিরণের তাপমাত্রা জেনে আমরা সহজেই হিসাব করে ফেলতে পারি যে জন্মের প্রায় এক বছর পর মহাবিশ্বের সবখানে তাপমাত্রা ছিল প্রায় এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রা এতটাই বেশি যে এতে যৌগিক পরমাণুর কেন্দ্রের পক্ষেও টিকে থাকা সম্ভব নয়। সেই সময় বস্তু অবশ্যই এর সবচেয়ে মৌলিক উপাদানে বিভক্ত ছিল। ফলে এ সময় প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের মতো মৌলিক17 কণিকারা বিচরণ করছিল থরে থরে। কিন্তু তাপমাত্রা একটু কমলে নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটা সম্ভব হলো। বিশেষ করে প্রোটন ও নিউট্রন মুক্তভাবে জোড়ায় জোড়ায় যুক্ত হবার সুযোগ পেল। শেষ পর্যন্ত এই জোড়াগুলোই যুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র (নিউক্লিয়াস) গঠন করে। হিসাব করে দেখা গেছে, এই নিউক্লীয় প্রক্রিয়াগুলো চলছিল প্রায় তিন মিনিট ধরে (এর ওপর ভিত্তি করেই স্টিভেন উইনবার্গ বইয়ের নাম দিয়েছিলেন দ্য ফার্স্ট থ্রি মিনিটস)। এটুকুন সময়ের মধ্যে প্রায় চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ পদার্থ হিলিয়ামে পরিণত হয়। এতে করে উপস্থিত সবগুলো নিউট্রন কণা শেষ হয়ে যায়। ফলে আর কোনো উপায় না দেখে বাকি সব অযুক্ত প্রোটনগুলো হাইড্রোজেন18 নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। তার মানে তত্ত্ব বলছে, মহাবিশ্বে প্রায় ৭৫ ভাগ হাইড্রোজেন ও ২৫ ভাগ হিলিয়াম থাকা উচিৎ। বর্তমান সময়ের হিসাব-নিকাশের সাথে এই বক্তব্যের খুব ভালো মিল পাওয়া গেছে।

আদিম সেই নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় সম্ভবত সামান্য পরিমাণ ডিউটেরিয়াম19 , হিলিয়াম-৩ এবং লিথিয়ামও তৈরি হয়েছিল। তবে ভারী মৌলগুলো বিগ ব্যাংয়ের সময় তৈরি হয়নি। মহাজাগতিক পদার্থগুলোর মধ্যে এদের পরিমাণ এক শতাংশেরও কম। এগুলো প্রস্তত হয়েছিল আরও অনেক পরে। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে। সেটা কীভাবে হয়েছিল তা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখব।

সব মিলিয়ে মহাবিশ্বের প্রসারণ, মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ এবং রাসায়নিক মৌলের আপেক্ষিক্ত প্রাচুর্য- এই বিষয়গুলো বিগ ব্যাং তত্ত্বের পক্ষে জোরালো প্রমাণ। তবে অনেক প্রশ্নের জবাব এখনও অজানা। যেমন, মহাবিশ্ব ঠিক এই হারেই কেন প্রসারিত হচ্ছে? মানে, বিগ ব্যাং কেন এত বিগ (বড়) ছিল? প্রাথমিক মহাবিশ্ব কেন এতটা সুষম (সব দিকে একই রকম) ছিল? এহাশূন্যের সব দিকে কেনইবা প্রসারণ হার এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল? কোব (COBE) যে একটু ব্যতিক্রম ঘনত্বের অঞ্চল খুঁজে পেয়েছে তারই বা উত্স কী ছিল? ছায়াপথ ও ছায়াপথ গুচ্ছ তৈরিতে কিন্তু এটুকু ব্যতিক্রমের খুব দরকার ছিল।

এই বড় ধাঁধাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বড় বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উচ্চ-শক্তির কণাপদার্থবিদ্যার সাথে বিগ ব্যাং তত্ত্বকে একীভূত করা হচ্ছে। একটা বিষয় আগেই বলে রাখি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ‘নতুন কসমোলজি’ কিন্তু আগে আলোচিত বিষয়গুলোর চেয়ে একটু কম নির্ভরযোগ্য। বিশেষ করে কণিকার যে পরিমাণ শক্তি প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিতে সংঘটিত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব আমরা। আর এই প্রক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয়েছিল মহাবিশ্বের জন্মের পরের সেকেন্ডের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে। সেই সময়ের অবস্থা সম্ভবত এতটাই চরম ছিল যে বর্তমানে গাণিতক নমুনা (model) ছাড়া আমাদের হাতে কিছুই নেই। এই নমুনার ভিত্তি নিছকই তাত্ত্বিক কিছু ধারণা। সময় আকার স্ফীতি এই নতুন কসমোলজির একটি অনুমান হলো ইনফ্লেশন বা স্ফীতি (inflation) নামের একটি প্রক্রিয়া। এটির মূল বক্তব্য হলো, এক সেকেন্ডের প্রথম ভগ্নাংশের কোনো এক সময়ের মধ্যে মহাবিশ্ব হঠাৎ করে বড় হয়ে বিশাল আকার ধারণ করে। বিষয়টি বুঝতে হলে ৩.২ চিত্রটি আবার দেখুন। রেখাটি সব সময় নিচের দিকেই বেঁকে আসে। তার মানে, স্থানের সাইজ বড় হতে থাকলেও তা হয় ক্রমেই আগের চয়ে অল্প হারে। অন্য দিকে, স্ফীতির সময় প্রসারণ ঘটেছিল ক্রমশ আগের চেয়ে দ্রুত বেগে। এ অবস্থাটি দেখানো হয়েছে ৩.৩ নং চিত্রে (সঠিক মাপকাঠিতে নয়)। প্রথমে প্রসারণ থামছিল, কিন্তু স্ফীতি শুরু হতে হতে এটি দ্রুত বেড়ে যায়। কিছু সময়ের জন্যে রেখাটি উপরের দিকে ছুটতে থাকে। শেষে রেখাটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু এর মধ্যেই স্থানের সাহজ ৩.২ চিত্রের অবস্থানের তুলনায় অনেক অনেক বড় হয়ে যায় (এখানে যা দেখানো হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি)।

Inflation of Universe

Figure 3.4: Inflation of Universe

চিত্র ৩.৩:স্ফীতির স্বরূপ। একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে শুরু হওয়ার পরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহাবিশ্ব হঠাৎ করে বিশাল বড় হয়ে যায়। উলম্ব অক্ষটিকে খুব বেশি সঙ্কুচিত করে দেখানো হয়েছে। স্ফীতি দশার পরে প্রসারণের হার ক্রমশ কমতে থাকে। ৩.২ চিত্রের মতোই।

কিন্তু মহাবিশ্বের আচরণ কেন এমন হলো? এখানে মাথায় রাখতে হবে যে রেখার নীচের দিকের গতিটা পেছনে দায়ী হলো মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল। এটি প্রসারণকে থামিয়ে দিতে চায়। ফলে উপরের দিকে গতিকে এক ধরনের অ্যান্টিগ্র্যাভিটি বা বিপরীত মহাকর্ষ তথা বিকর্ষণ বলের প্রভাব ধরে নেওয়া যেতে পারে। যার ফলে মহাবিশ্বের সাইজ ক্রমশ বড় হচ্ছে। বিপরীত মহাকর্ষের ধারণাকে খুব অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু অনুমাননির্ভর তত্ত্বের মতে একেবারে প্রাথমিক মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ও ঘনত্বের চরম অবস্থায় এমন কিছু ঘটে থাকতেও পারে।

সেটা কীভাবে তা বলার আগে আমি বলতে চাই কীভাবে স্ফীতি তত্ত্ব ওপরে উল্লিখিত কিছু মহাজাগতিক ধাঁধার সমাধান করতে পারে। প্রথমত, ক্রমশ দ্রুত হারের প্রসারণ থেকে বিগ ব্যাং কেন এত বড় ছিল তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অ্যান্টিগ্র্যাভিটি প্রভাবটি বেশ অস্থিতিশীল ও তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া। তার মানে, মহাবিশ্বের সাইজ বড় হয় সূচকীয় হারে (exponentially)। গাণিতিকভাবে বললে এ কথার মানে দাঁড়ায়, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরমািণ স্থানের আকার দ্বিগুণ হয়। ধরা যাক, এ সময়টির নাম একটি টিক। তাহলে দুটি টিক পরে সাইজ হবে চারগুণ। তিন টিকের পরে আটগুণ। দশ টিকের পরে স্থানটি প্রসারিত হবে ১০ হাজার গুণেরও বেশি। হিসাব করে দেখা গেছে, স্ফীতি যুগ পরবর্তী প্রসারণ হার বর্তমান সময়ে পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত প্রসারণ হারের সাথে মিলে গেছে। (এটা দ্বারা আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছি তা আমি ষষ্ঠ অধ্যায়ে সবিস্তারে বলব)

স্ফীতির কারণে সাইজ বেড়ে যাওয়া থেকে মহাবিশ্বের সুষম হবার পেছনের কারণটাও সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। স্থানের প্রসারণের কারণে প্রাথমিক যেকোনো বিষমতা উধাও হয়ে যাবে। বেলুনকে ফুলিয়ে বড় করলে যেভাবে এর ভাঁজগুলো উধাও হয়ে যায় সেভাবেই। একইভাবে, প্রাথমিক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রসারণের যে ভিন্নতা ছিল তাও স্ফীতির প্রভাবে কিছু সময় পরে মিলিয়ে যায়। কারণ, স্ফীতি সব দিকে সমান তেজে কাজ করে। তাহলে কোব যে সামান্য বিষমতা পেল তার ব্যাখ্যা কী? এর কারণ সম্ভবত স্ফীতি একই সময়ে সকল জায়গায় থামেনি (এর কারণও একটু পরে বলছি)। ফলে কিছু অঞ্চল অন্য অঞ্চলের চেয়ে একটু বেশি ফুলে-ফেঁপে গিয়েছিল। ফলে ঘনত্বেও হয়ে গিয়েছিল কিছু তারতম্য।

এবার কিছু সংখ্যা নিয়ে কথা বলি। স্ফীতি তত্ত্বের সবচেয়ে সরল রূপটিতে স্ফীতির (অ্যান্টিগ্যাভিটি) শক্তি খুব বেশি শক্তিশালী। যা মহাবিশ্বকে এক সেকেন্ডের প্রায় ১০ লক্ষ কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ বড় করে ফেলে। অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই সময়টিকেই আমি একটু আগে এক টিক বলেছিলাম। মাত্র ১০০ টি টিকের পরেই একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সাইজের স্থান ফুলে-ফেঁপে গিয়ে এক লাখ আলোকবর্ষ চওড়া অঞ্চল হয়ে যায়। আগে বলে আসা মহাজাগতিব রহস্যের ব্যাখ্যায় এটা পুরোপুরি যথেষ্ট।

অতিপারমাণবিক কণাপদার্থবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের সাহায্যে স্ফীতির উদ্রেককারী অনেকগুলো সম্ভাব্য প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সবগুলো প্রক্রিয়াই কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম নামে একটি ধারণার ওপর নির্ভরশীল। এটা বুঝতে হলে আগে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে কিছু কথা জেনে আসতে হবে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূচনা ঘটেছিল আলো, তাপ ইত্যাদি তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের ধর্ম সম্পর্কে একটি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এই বিকিরণ স্থানের ভেতর দিয়ে তরঙ্গ আকারে চললেও এটি আবার এমনভাবেও আচরণ করতে পারে যাতে মনে হয় এটি আসলে কণা দিয়ে গঠিত। আলোর নির্গমন ও শোষণ ঘটে শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেট বা গুচ্ছ (কোয়ান্টা) আকারে। এই গুচ্ছগুলোর নাম ফোটন। তরঙ্গ ও কণাময় আচরণের এই সমাবেশ পারমাণবিক ও অতিপারমাণবিক জগতের সব বস্তুর ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ফলে, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি যে সত্ত্বাগুলোকে সাধরণভাবে কণা মনে কার হয়, তাদের সবাই-ই, এমনকি পুরো পরমাণুও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তরঙ্গের মতো আচরণ করতে পারে।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি প্রধান অংশ হলো ওয়ের্নার হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি। এটি অনুসারে কোয়ান্টাম বস্তুদের সবগুলো বৈশিষ্ট্যের জন্যে সুসংজ্ঞায়তি মান থাকবে না। যেমন একটি ইলেকট্রনের একই সাথে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান ও নির্দিষ্ট ভরবেগ থাকতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে এর শক্তির মানও নির্দিষ্ট থাকতে পারে না। এখানে কাজ করে শক্তির মানের অনিশ্চয়তা। আমাদের চিরচেনা বড় জগতে তো শক্তি সব সময় সংরক্ষিত20 থাকে (এর সৃষ্টি বা বিনাশ নেই)। কিন্তু কোয়ান্টাম জগতে নীতিটিকে স্থগিত করে রাখা যায়। এক মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্তে স্বতস্ফূর্ত ও অননুমেয়ভাবে শক্তির পরিমাণ বদলে যেতে পারে। যত অল্প সময় বিবেচনা করা হবে, এই দৈব কোয়ান্টাম বিষমতাও তত বেশি হবে। সত্যি বলতে, কণাটি শূন্য থেকেই শক্তি ধার করতে পারে, যদি কি না আবার খুব দ্রুতই সেই শক্তি পরিশোধ করে দেওয়া হয়। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতির সূক্ষ্ম গাণিতিক ভাষ্য মতে বড় আকারে ধার করা শক্তি দ্রুত ফিরিয়ে দিতে হয়। আর ছোট ঋণের মেয়াদ হয় বেশি।

শক্তির এই অনিশ্চয়তা থেকে কিছু দারুণ ফলাফল বেরিয়ে আসে। এমনও সম্ভাবনা আছে হঠাৎ করে শূন্য থেকে ফোটনের মতো একটি কণা তৈরি হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল খানিক পরেই। এই কণাগুলোর অস্তিত্ব টিকে থাকে ধার করা শক্তির ওপর নির্ভর করে। এবং সেই কারণে এই অস্তিত্ব নির্ভর করে সময়ের ওপরও। আমরা এদেরকে দেখি না কারণ এরা হয় খুবই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু আমরা যাকে শূন্য স্থান বলে মনে করি সেটা আসলে এ ধরনের ক্ষণস্থায়ী কণায় পরিপূর্ণ। শুধু ফোটনই নয়, এমন কণার মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও অন্য সবাই। আমাদের পরিচিত ও স্থায়ী কণাগুলো থেকে আলাদা করার জন্যে এই ক্ষণস্থায়ী কণাদেরকে বলা হয় ভার্চুয়াল কণা। স্থায়ীদের নাম যেখানে বাস্তব কণা।

অস্থায়িত্বের কথা বাদ দিলে ভার্চুয়াল কণার সাথে বাস্তব কণার কোনো পার্থক্য নেই। এবং বাইরে থেকে শক্তি সরবারহ করে হাইজেনবার্গ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করলে ভার্চুয়াল কণাদেরকে বাস্তব কণায়ও রূপান্তুরিত করা সম্ভব। এবং সত্যি বলতে, একে তখন একই ধরনের অন্য বাস্তব কণা থেকে আলাদা করে চেনাও সম্ভব নয়। যেমন একটি ভার্চুয়াল ইলেকট্রন সাধারণত মাত্র ১০-২১ সেকেন্ড সময় স্থায়ী হয়। স্বল্পায়ুর জীবনে এটি কিন্তু স্থির বসে থাকে না। বিনাশ হবার আগে আগে অতিক্রম করে ফেলতে পারে ১০-১১ সেন্টিমিটার পথ (যেখানে একটি পরমাণু ১০-৮ সেন্টিমিটার চওড়া)। এই সময়ের মধ্যেই যদি ভার্চুয়াল ইলেকট্রনটি কোথাও থেকে শক্তি গ্রহণ করতে পারে (যেমন ধরুন তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র থেকে), তাহলে আর একে বিলুপ্ত হতে হবে না। এটি তখন বিলকুল স্বাভাবিক ইলেকট্রন হিসেবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে।

আমরা এই ভার্চুয়াল কণাদেরকে দেখতে না পেলেও জানি যে শূন্য স্থানে এদের অস্তিত্ব আছে। কারণ এদের শনাক্তযোগ্য লক্ষণ এরা রেখে যায়। যেমন ভার্চুয়াল ফোটনের একটি প্রভাব হলো, এটি পরমাণুর শক্তি স্তরে21 শক্তির সামান্য পরিবর্তন তৈরি করে। এছাড়াও ইলেকট্রনের চৌম্বক ভ্রামকেও সমান পরিমাণ পরিবর্তন ঘটায়। বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতিতে ইতোমধ্যেই এই ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা হয়েছে।

কিন্তু আরেকটি বিষয় এড়িয়ে গেল ভুল হয়ে যাবে। কারণ হলো অতিপারমাণবিক কণিকারা কিন্তু মুক্তভাবে চলাচল করে না। এটা নির্ভর করে অনেকগুলো বলের ওপর। কোন প্রকার বল কাজ করবে সেটা নির্ভর করবে কণার প্রকৃতির ওপর। এ বলের প্রভাবে কিন্তু উপরে দেওয়া কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের সরল চিত্রটি একদম পাল্টে যায়। এই বল কণাদের স্ব স্ব ভার্চুয়াল কণাদের মধ্যেও কাজ করে। অতএব হতে পারে একের বেশি ধরনের ভ্যাকুয়াম অবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে। একাধিক সম্ভাব্য কোয়ান্টাম অবস্থার (স্টেট) অস্তিত্ব কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার একটি পরিচিত দিক। এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হলো পরমাণুর বিভিন্ন শক্তি স্তর। পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রন শুধু নির্দিষ্ট শক্তির কিছু সুসংজ্ঞায়িত অবস্থাতেই অস্তিত্ববান থাকতে পারে। সবচেয়ে নীচের স্তরের নাম গ্রাউন্ড স্টেট। এটা স্থিতিশীল অবস্থা। উচ্চতর অবস্থাগুলো উত্তেজিত ও অস্থিতিশীল। কোনো ইলেকট্রন উচ্চতর অবস্থায় চলে গেলে এটি এক বা একাধিক ধাপে পুনরায় নীচের স্তরে অবস্থিত গ্রাউন্ড স্টেটে চলে আসবে। সুসংজ্ঞায়িত অর্ধায়ু (half life) বিশিষ্ট উত্তেজিত অবস্থা এভাবেই ক্ষয় হতে থাকে।

ভ্যাকুয়ামের ক্ষেত্রেও একই নীতি কাজ করে। এতে এক বা একাধিক উত্তেজিত স্টেট থাকতে পারে। এই স্টেটগুলোর শক্তির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। অবশ্য তাদেরকে দেখতে একই রকম দেখাবে। আর যাই হোক, সবই তো খালি! সর্বনিম্ন শক্তি স্তর বা গ্রাউন্ড স্টেটকে অনেক সময় বলা হয় প্রকৃত ভ্যাকুয়াম। কারণ, এটাই হলো স্থিতিশীল অবস্থা। এবং এটিই আমাদের বর্তমানের দেখা মহাবিশ্বের শূন্য স্থান হিসেবে কাজ করে। উত্তেজিত ভ্যাকুয়ামকে বলা হয় নকল ভ্যাকুয়াম।

তবে বলে রাখা ভাল, নকল ভ্যাকুয়াম এখন পর্যন্ত নিছকই তাত্ত্বিক একটি ধারণা। এবং এদের বৈশিষ্ট্যও মূলত নির্ভর করে কোন তত্ত্ব দিয়ে এদেরকে বিচার করা হচ্ছে তার ওপর। তবে সাম্প্রতিক তত্ত্বগুলোতে এদের ধারণা সহজাতভাবেই চলে আসে। এ তত্ত্বগুলোর লক্ষ্য হলো প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলকে একীভূত করা। বলগুলো হলো মহাকর্ষ, আমাদের পরিচিত তড়িচ্চুম্বকীয় বল এবং স্বল্প-পাল্লার দুটি নিউক্লীয় বল, যারা দুর্বল ও সবল বল হিসেবে পরিচতি। এক সময় অবশ্য তালিকাটা আরও লম্বা ছিল। তড়িৎ ও চৌম্বক বলকে এক সময় আলাদা ভাবা হত। একীভূত করার কাজ শুরু হয় ঊনিশ শতকের শুরুর দিকে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে এ কাজে ভালো অগ্রগতি হয়েছে। এখন জানা হয়ে গেছে যে তড়িচ্চুম্বকীয় এবং দুর্বল নিউক্লীয় বল একই সুতোয় গাঁথা। একে এক কথায় বলা হচ্ছে তড়িত্দুর্বল বল (electroweak force)। বহু পদার্থবিদ বিশ্বাস করেন, সবল বলও তড়িত্দুর্বল বলের সাথে মিলে যাবে। এমন মিল তৈরিতে সক্ষম তত্ত্বগুলোকে বলা হয় গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি। এটা হওয়া খুব সম্ভব যে গভীর কোনো পর্যায়ে সবগুলো ফোর্স বা বল একটিমাত্র সুপার-ফোর্সে এসে মিলিত হবে।

স্ফীতি প্রক্রিয়ার সবচেয়ে ভালো ব্যখ্যাগুলো পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি থেকেই। এ তত্ত্বগুলোর একটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো নকল ভ্যাকুয়াম স্টেটের শক্তি অনেক বেশি। মাত্র এক ঘনমিটার স্থানের শক্তি ১০৮৭ জুল22 এমন অবস্থায় পরমাণুর মতো ছোট্ট আয়তনের জায়গায়ও ১০৬২ জুল শক্তি থাকবে। যেখানে একটি উত্তেজিত পরমাণুর শক্তি মাত্র ১০-১৮ জুল। ফলে প্রকৃত ভ্যাকুয়ামকে উত্তেজিত হতে অনেক অনেক বেশি শক্তি প্রয়োজন। এবং বর্তমান মহাবিশ্বে নকল ভ্যাকুয়ামের দেখা পাওয়ার আশাও নেই। তবে বিগ ব্যাংয়ের মতো চরম অবস্থায় বিষয়গুলো সম্ভব।

নকল ভ্যাকুয়াম স্টেটে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি থাকে তার থাকে তীব্র মহাকর্ষীয় প্রভাবও। কারণ, আইনস্টাইন আমাদের দেখিয়েছেন, শক্তিরও ভর আছে। ফলে সাধারণ বস্তুর মতো এরও মহাকর্ষীয় আকর্ষণ থাকবে। কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের তীব্র শক্তি খুব তীব্র আকর্ষণধর্মী। এক ঘনমিটার নকল ভ্যাকুয়ামের শক্তি ১০৬৭ টন ভরের সমান। পর্যবেক্ষণযোগ্য পুরো মহাবিশ্বের ভরও আরও কম (১০৫০)। এই তীব্র মহাকর্ষ স্ফীতির পক্ষে কথা বলে না। স্ফীতির জন্যে দরকার কোনো রকম একটি অ্যান্টিগ্র্যাভিটি। কিন্তু নকল ভ্যাকুয়ামের বিশাল শক্তির জন্যে দরকার একই রকম বিশাল পরিমাণ নকল ভ্যাকুয়াম চাপ (false-vacuum pressure)। এই চাপটাই কিন্তু আসল বিষয়। আমরা সাধারণত চাপকে মহাকর্ষের উত্স মনে করি না। কিন্তু আসলে সেটি উত্স হিসেবে কাজ করে। বাইরের দিকে যান্ত্রিণ বল প্রয়োগ করলেও চাপ আবার ভেতরের দিকেও মহাকর্ষীয় টান তৈরি করে। আমাদের সদা-পরিচিত বস্তুদের ক্ষেত্রে তার ভরের তুলনায় চাপের মহাকর্ষীয় প্রভাব খুব নগণ্য। যেমন, পৃথিবীতে আপনার ওজনের একশ কোটি ভাগের এক ভাগেরও কমের পেছনে দায়ী হলো পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ চাপ। কিন্তু তবুও এটা কিন্তু বাস্তব। এবং কোনো সিস্টেমে চাপ অত্যধিক হলে ভরজনিত মহাকর্ষীয় প্রভাবের চেয়েও এটি বেশি করে অনুভূত হবে।

নকল ভ্যাকুয়ামের ক্ষেত্রে শক্তি23 যেমন বিশাল, তেমনি বিশাল তার চাপ। কিন্তু, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চাপ এখানে ঋণাত্মক। ফলে নকল ভ্যাকুয়াম ধাক্কা দেয় না, বরং টানে। ঋণাত্মক চাপ তৈরি করে ঋণাত্মক মহাকর্ষীয় টান। মানে অ্যান্টিগ্র্যাভিটি। ফলে নকল ভ্যাকুয়ামের মহাকর্ষ নিয়ে শক্তির আকর্ষণধর্মী ও চাপের বিকর্ষণধর্মী প্রভাবের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। জিত হয় চাপেরই। এবং বিকর্ষণের নিট প্রভাব এত বেশি যে এটি মুহূর্তের মধ্যে মহাবিশ্বকে উড়িয়ে দিতে পারে। স্ফীতির এমন তীব্র ধাক্কার ফলেই মহাবিশ্ব প্রতি ১০-৩৪ সেকেন্ডের মতো ক্ষুদ্র সময়ে প্রচণ্ড গতিতে দ্বিগুণ বড় হয়েছিল।

নকল ভ্যাকুয়াম সহজাতভাবে অস্থিতিশীল। সকল উত্তেজিত কোয়ান্টাম স্টেটের মতো এটিও ক্ষয় হয়ে গ্রাউন্ড স্টেটে, মানে প্রকৃত ভ্যাকুয়ামে আসতে চায়। সম্ভবত কয়েক ডজন ‘টিক’ পার হলে এটি এটা করতে সক্ষম হয়। কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া হবার কারণে এর মধ্যে অনিবার্যভাবে কাজ করে অনিশ্চয়তা ও দৈব পরিবর্তন, যেটা একটু আগে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির কথা বলতে গিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার মানে, স্থানের সব দিকে ক্ষয় একই হারে ঘটবে না। বিভিন্ন দিকে তা হবে আলাদাভাবে। কিছু কিছু তাত্ত্বিকের মতে কোব (COBE) যে ব্যতিক্রম খুঁজে পেয়েছে তার কারণ এই ভিন্নতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নকল ভ্যাকুয়াম ক্ষয় হয়ে গেলে মহাবিশ্ব তার স্বাভাবিক প্রসারণ শুরু করল। মানে ধীরে ধীরে কমল প্রসারণের হার। নকল ভ্যাকুয়ামে আবদ্ধ শক্তি অবমুক্ত হলো। এটা বের হলো তাপ আকারে। স্ফীতির কারণে যে বিশাল প্রসারণ ঘটল, তাতে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা পরম শূন্যের খুব কাছাকাছি হলো। হঠাৎ স্ফীতি থেমে যাওয়ায় তাপমাত্রা আবার বেড়ে ১০২৮ ডিগ্রি হয়ে গেল। এই বিপুল তাপ আজও রয়ে গেছে। অবশ্য সেটার তীব্রতা অনেক কমে গেছে। এরই নাম মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণ। ভ্যাকুয়াম এনার্জি অবমুক্ত হবার পাশাপাশি আরেকটি ঘটনাও ঘটল। কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের অনেকগুলো কণা এ থেকে কিছু শক্তি গ্রহণ করে বাস্তব কণায় উন্নীত হলো। আরও কিছু প্রক্রিয়া ও পরিবর্তন শেষে এই আদিম কণাগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে ১০৫০ টন পদার্থ তৈরি হলো। এই পদার্থ থেকেই আপনি, আমি, ছায়াপথ ও মহাবিশ্বের বাকিটার সৃষ্টি।

বড় বড় অনেক কসমোলজিস্টই মনে করেন স্ফীতির ধারণাই মহাবিশ্বের ইতিহাসের সত্যিকার চিত্র প্রদান করে। যদি এটি আসলেই সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে মহাবিশ্বের মৌলিক কাঠামো এবং ভৌত উপাদানসমূহ কেমন হবে তা ঠিক হয়ে গিয়েছিল জন্মের মাত্র ১০-৩২ সেকেন্ড পরেই। স্ফীতির পরে মহাবিশ্বের অতিপারমাণবিক স্তরে ঘটেছিল আরও নানান পরিবর্তন। প্রাথমিক পদার্থ থেকে তৈরি হলো কণা ও পরমাণু। আমাদের সময়ের মহাজাগতিক বস্তুগুলো এদের দিয়েই গড়া। তবে পদার্থের অধিকাংশ বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছিল মাত্র প্রায় তিন মিনিটের মধ্যে।

প্রথম তিন মিনিটের সাথে শেষ তিন মিনিটের সম্পর্ক কী? একটি বুলেটের ভাগ্য যেমন এর লক্ষ্যমাত্রার ওপর খুব বেশি নির্ভর করে, তেমনি মহাবিশ্বের পরিণতিও এর প্রাথমিক অবস্থার ওপর দারুণভাবে নির্ভরশীল। আমরা সামনে দেখব, প্রাথমিক সূচনা থেকে মহাবিশ্বের প্রসারণ ও বিগ ব্যাং থেকে উদ্ভূত পদার্থের প্রকৃতি মহাবিশ্বের চূড়ান্ত ভবিষ্যৎকে কীভাবে প্রভাবিত করে। মহাবিশ্বের শুরু ও শেষ একই সুতোয় গেঁথে আছে শক্তভাবে।